কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরেঃ জন্ম, ইতিহাস-অনুষঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'ঢাকার ডাক'

রঙিলী বিশ্বাস

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookRongili

প্রাক্‌কথন

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ২১শে ফেব্রুয়ারির গান 'ঢাকার ডাক'। গাইছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৩০শে এপ্রিল, ২০২৪। আমার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের ছাত্ররা: নোবেল, কমল, কাফি, পিয়াল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে আমার ফিরে যাওয়া ৩৩ বছর পর, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঢাকায় যাবার ৪৪ বছর পর। সে-সময় (ফেব্রুয়ারি/মার্চ, ১৯৮০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও টঙ্গীতে হাজার হাজার শ্রমিক জমায়েতের সামনে তাঁর দল 'মাস্ সিঙ্গারস্'কে নিয়ে গান গেয়েছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। 'ডাকসু', 'উদীচী', 'গণতান্ত্রিক লেখক শিবির'-এর মতো সংগঠন এবং বদরুদ্দীন উমর, শাহরিয়ার কবীরের মতো ব্যক্তিত্বের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন জায়গার অনুষ্ঠানে যে দুটি গান সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল তা হলো 'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ' আর 'ঢাকার ডাক'। এ নিয়ে বিস্তারিত লেখা পরে, কিন্তু এবার ঢাকায় গিয়ে 'ঢাকার ডাক' গাওয়ার মুহূর্তগুলি, যখন দোহারকিতে রয়েছে সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আর যখন 'কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরে'র মতো পঙ্‌ক্তিতে এসে ধুয়ো ধরছেন উপস্থিত সবাই, তখন সামগ্রিকভাবে যা হয়ে উঠছে তা আমার গায়কজীবনেও অনাস্বাদিতপূর্ব এক অভিজ্ঞতা।

ফিরে আসার পর জুন-জুলাই-এর উত্তুঙ্গ বাংলাদেশে– যাকে অনেকেই জুলাই অভ্যুত্থান বা দ্বিতীয় স্বাধীনতার আখ্যা দিয়েছেন– এই গানের কথাগুলোর এক আশ্চর্য পুনরুত্থান ঘটল। যেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস আবার লিখছেন এ গান, যেন এ লেখা একভাবে পূর্বনির্দিষ্ট ছিল:

ও ভাইরে ভাই– রফিকুলের মাথার খুলি
উড়ায় গরম শিশির গুলিরে
যেমন ফোরাত নদীর পাড়ে আজগর
বিষ তীর খাইয়া মরে।

অথবা,

ও ভাইরে ভাই-নিয়া আজিমপুরের গোরস্থানে
রাইতের নেশায় অতি গোপনে রে
বিনা জানাজা বিনা কাফনে
মাটি দিল কবরে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'দিনব্যাপী সেমিনারে পরিচয় হয়েছিল পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনারত এম. আব্দুল আলীম-এর সঙ্গে– যিনি বহু বছর ধরে ভাষা আন্দোলন ও তার পারিপার্শ্বিক দিক নিয়ে গবেষণারত। শেষদিনের সান্ধ্য-আড্ডার অবকাশে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার বলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে যে যে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, অদ্যাবধি তার সর্বপ্রথমটি বস্তুত কলকাতা থেকেই প্রকাশিত। দ্বিতীয়বার বললাম, কারণ প্রথমবার এ বিস্ময়কর (না কি ততটা নয়?) খবরটি আমাকে দিয়েছিলেন বাংলাদেশেরই একজন বহুবছর আগে আচম্বিতে এবং দূরাভাষে– এবং আমার কাছে তিনি এ-বিষয়ে বিশদ তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, আমি কিছুই বলতে পারিনি, বলেছিলাম বরং আপনি যদি আরো কিছু তথ্য কখনও পান, আমাকে জানাবেন।

কলকাতা ফিরে আসার পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি আমাকে বইটির প্রচ্ছদ, সম্পূর্ণ গান এবং ভূমিকার কিছু অংশ পাঠান। তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি:

> আমরা এতদিন ধরে জেনে আসছি একুশের প্রথম সংকলন হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (মার্চ ১৯৫৩)। কিন্তু এর আগে 'ওরা প্রাণ দিল' (সেপ্টেম্বর ১৯৫২) নামে একুশের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ভারতের কলকাতার বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বেনু প্রকাশনী থেকে। প্রকাশক শিবব্রত সেন। সংকলনটির সম্পাদক ছিলেন মানিকগঞ্জের কমিউনিস্ট-কর্মী প্রমথ নন্দী। চিত্রশিল্পী সোমনাথ হোড় প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন। সংকলনটিতে মোট সাতটি কবিতা স্থান পায়: কবিতাগুলো হলো– হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'ঢাকার ডাক', মুর্তজা বশীরের 'পারবে না', নিত্য বসুর 'জননী গো', বিমল চন্দ্রের 'শহীদ বাংলা', সৈয়দ আবুল হুদার 'জন্মভূমি', তানিয়া বেগমের 'বন্ধুর খোঁজে' এবং প্রমথ নন্দীর 'প্রিয় বন্ধু আমার'। পূর্ববঙ্গ সরকার ১৯৫৩ সালে সংকলনটি নিষিদ্ধ করে। মোহাম্মদ সুলতানের পুঁথিঘর প্রকাশনীতে পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে এটি খুঁজে পেয়েছিলেন ফজলুল করিম। পরে তিনি তাঁর 'বায়ান্ন'র কারাগার' গ্রন্থের শেষে এটি মুদ্রিত করেন।

এবার ঢাকা সফর ব্যতীত সরাসরি এই তথ্য আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। এই বই-এর প্রচ্ছদের ছবিটি রইল সঙ্গে।

সম্পূর্ণ গানটি ছিল এরকম

ঢাকার ডাক

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

(পূর্ব বঙ্গের গাথার ঢঙে রচিত)

শোনো দেশের ভাই ভগিনী
শোনো আচানক কাহিনী।
কান্দে বাংলা জননী
ঢাকার শহরে।

ও ভাইরে ভাই- ছিল বুড়ীগঙ্গার মরা পানি
তার বুকে কে আনিলো জোয়াণী রে
কার কইলজার খুনে বয় উজানী
শুকনা বালুর চরে।

ও ভাইরে ভাই- একুশে ফেব্রুয়ারি দিনে
সুখের মতো নয়া ফাগুনে রে
হঠাৎ দিন দুপুরে অমানিশার
ঢাকলো অন্ধকারে ॥

ও ভাইরে ভাই- যে ভাষায় আমার ফুটে বুলি
ফুটে আমার প্রাণের কলি রে
সেই গুলবাগে চালাইলো গুলি
নিতে সেই ফুল ছিঁড়ে ॥

ও ভাইরে ভাই- যত ইস্কুল কলেজ বিদ্যালয়ে
ধ্বংসের আগুণ দিল জ্বালাইয়ে রে
কত বাপের আশা, মায়ের ভাষা
সেই অনলে পুড়ে ॥

ও ভাই রে ভাই- কত ছাওয়াল ছাত্র দেশের রত্ন
ছিল তাদের কতই স্বপ্ন রে
(কুহু) কুহ না ডাকিতে কোকিল
লুটায় লহুর ধারে ॥

ও ভাইরে ভাই- রফিকুলের মাথার খুলি
উড়ায় গরম শিশির গুলিরে
যেমন ফোরাত নদীর পাড়ে আজগর
বিষ তীর খাইয়া মরে ॥

ও ভাইরে ভাই- পরের দিন শহীদ মিছিলে
বিদ্রোহের বান্ধ গেল খুলেরে
ছাত্র মজুর কেরাণী মিলে
জন সমুদ্দুরে ॥

ও ভাইরে ভাই- আইল যখন হাইকোর্টের ধারে
আচমকা ঝাপাইয়া পড়েরেজ-
তাজা রক্ত মাংস খাইল ছিঁড়ে
(যত) হিংস্র জানোয়ারে ॥

ও ভাইরে ভাই (তবু) খুনি কসাইর মিটেনা তিয়াস
হাটে, বাটে জমলো লাশরে
রমনার সবুজ মাছ ঘাসের মাটি
লাল হইল রুধিরে ॥

ও ভাইরে ভাই-নিয়া আজিমপুরের গোরস্থানে
রাইতের নেশায় অতি গোপনে রে
বিনা জানাজা বিনা কাফনে
মাটি দিল কবরে ॥

ও ভাইরে ভাই তবু শোন আজব ব্যাপার
ওঠে রাতারাতি শহীদ মিনার রে
দুশমন যত ভাঙ্গে তারে
ওঠে সে বারে বারে ॥

ও ভাইরে ভাই শহীদের খুনের রাঙা পিরান
নিশান হইয়া ছাইলো আসমান রে
সেই নিশানে কেয়ামতের নিশানী
দিল জালিমেরে ॥

ও ভাইরে ভাই (সেদিন) চাকা বন্ধ হইল রেলে
নারায়ণগঞ্জের সুতা কলে রে
সে দিন উঠল না ঢেউ পদ্মার জলে
সুজন নাইয়ার সুরে ॥

ও ভাইরে ভাই- ঘরের বধূ কুল-ললনা
বেহুস হইয়া আর কান্দে না রে
(আইল) হাজার হাজার বিবি সাকিনা।
লড়াই এর প্রান্তরে ॥

ও ভাইরে ভাই- ফুটল লাল ফাগুনে আগুনের ফুল
শহীদ আবুল বরকত রফিকুল রে
মেঘনার দুই কুল হইল আকুল

জীবনের জোয়ারে ॥

কাইন্দনা মা কাইন্দো না আর বঙ্গ জননী
তুমি যে বীর প্রসবিনী গো তুমি ফাতেমা জননী ॥

কে বলে তোমার অনাথিনী, অবলা রমনী
শত ক্ষুদিরাম, কানাই এর তুমি গর্ভধারিনী
নয়া-বাংলার কারবালায় কারা জান দিল কোরবাণী
শুনাও মাগো শুনাও সেই কাহিনী ॥

আইজ আনন্দের মহরম মা গো খুশীর আগমনী
পদ্মার বুকে মিলল ভাইয়া গঙ্গানদীর পানি
মহরুম আত্মার করে মোনাজাত বাংলার ভাই ভগিণী'
মুছ মাগো মুছ চক্ষের পানি ॥

কৃত্তিবাস চন্ডীদাস, আলোয়াল একই বৃক্ষের ফুল
মধু শরৎ রবীন্দ্রনাথ কায়কোবাদ নজরুল
এই বাংলা ভাষায় গাইয়া গেল যত আউল বাউল
(আইজ) ঢাকার সহরে তাদের সম্মিলনী ॥

যে ভাষায় আমি কান্দি হাসি, ভাষা আমার জান
যে ভাষায় রাখাল বাজায় বাঁশী, মাঝি ধরে টান
(আজ) মেশিনগান কি রুখতে পারে মোদের বাংলা গান
জান যাবে তো, যাবে না জবানী ॥

শহীদ স্তম্ভ ভাঙে কারা সাধ্য আছে কার
মোদের সিনায় সিনায় ওঠে শহীদের মিনার
সেই মিনারে মোয়াজ্জীনের নয়-জমানার
শোনো ভোরের শোনো আজান ধ্বনি ॥[১]

(বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত)

গানের শুরুতে পূর্ববঙ্গের গাথার ঢঙে লেখা বলে যা বলা হয়েছে তা বস্তুত এক শোকগাথা এবং অত্যুক্তি হয় না যদি বলি, এই গাথায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস জারিগানের এক আদল রাখতে চেয়েছেন। 'ময়মনসিংহের ব্যালাড গাইবার রীতি-অনুসারী গান বলে যখন একে হেমাঙ্গ বিশ্বাস পরে অভিহিত করছেন, তখন সম্ভবত এর দিকেই তিনি দিঙ্‌নির্দেশ করছেন। এটাও বোধকরি মনে রাখা উচিত যে, মহরম মাসে সারা বাংলাদেশে জারিগানের যে-সব আসর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, আজও তার মধ্যে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ

অঞ্চল সমধিক পরিচিত। অর্থাৎ, মহরম মাসে আহাজারিমূলক দিনরাতের জারিগানে ময়মনসিংহের বয়াতিদের অবস্থান এখনও খানিকটা বিশেষ। নেত্রকোণা, জারিগান এবং এই গাথার সম্পর্ককে নিয়ে পরে আরো কিছুটা আলোচনা করছি।

কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ; একসময়ের এই অতিখ্যাত গান, যা খানিকটা বিস্মৃতির দিকে চলে গেছেও বটে চর্চার অভাবে, সে-গান রচনা সম্পর্কে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখার দিকে ফিরে তাকানো।

গণনাট্য সংঘ, লোক-উপাদান ও বাহিরানা

তাঁর গান রচনার ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমিটি একটু ফিরে দেখা যাক:

> ...১৯৪১ সালে হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়। তখন আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ফ্যাসিস্টরা, গড়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্ট। এরই মধ্যে ১৯৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণনাট্য সংঘ'র জন্ম হয়। প্রগতি লেখকশিল্পী সঙ্ঘ (১৯৩৬) থেকে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে গণনাট্য সংঘের আত্মপ্রকাশের কারণ ছিল। লেখকদের কারবার লিখিত শব্দ নিয়ে, তাঁদের আবেদন সীমাবদ্ধ শিক্ষিতদের মধ্যে। কিন্তু আমরা যারা গান গাইতাম, নাটক করতাম তাদের আবেদন এই নিরক্ষর দেশে অনেক ব্যাপক জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের। সুতরাং গণনাট্য সংঘের আলাদা সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল।

তাঁর 'গণনাট্য ও আত্মকথা' (*উজান গাঙ বাইয়া*)-য় লিখছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

গণনাট্যের জন্মের শুরু থেকেই একথা একভাবে স্বীকৃত ছিল যে, শিল্পীদের সাংস্কৃতিক দিকগুলিকে যদি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে উঠে আসতে হয়, তাহলে গান, নাচ, ছায়ানাট্য, নাটক বা এ-ধরনের পারফর্মেটিভ আর্টে এ দেশের বিভিন্ন লোকজ আঙ্গিককে ব্যবহার করাই শ্রেয়, কারণ এগুলো মানুষের চেনা, এদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আত্মিক যোগাযোগ বহু শতাব্দীর। গণনাট্যের শিল্পীরা যদি মানুষেরই কাছে গিয়ে শিখতে পারেন সে-আঙ্গিক, আত্তীকৃত বা প্রয়োগ করতে পারেন তাদের নিজস্ব শিল্পে, সেটা তাঁদের কাজকে যে ব্যাপ্তি দেবে তা অন্য কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

আজকের স্বল্প পরিসরে বিষয়টির সম্পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, এই শিল্পগত আদর্শ একক বা যৌথভাবে যাঁরা পালন করার চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বহু লোকশিল্পী (একইসঙ্গে শ্রমজীবী মানুষ) আছেন। যেমন নিবারণ পণ্ডিত, গুরুদাস পাল, দাশরথি লাল, আন্নাভাও শাঠে, অমর শেখ, আছেন শহরে বাস-করা শিল্পীরাও, যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি বা গণনাট্য বা উভয়েরই সদস্য পদে আসীন থেকে বা না থেকে লোকজ ধারা থেকে নানা উপাদান আহরিত করে নিজেদের প্রতিবাদী সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ রেখেছিলেন নিবারণ পণ্ডিত বা গুরুদাস পালের মতো। এই শেষোক্ত মানুষদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখেন ঋত্বিক ঘটক, ভুপেন হাজারিকা, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় রায় এবং অবশ্যই হেমাঙ্গ বিশ্বাস। লোকসুর, লোকনাট্যের ধরন, দেশজ আঙ্গিককে আত্তীকরণে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, ভুপেন হাজারিকা, বিজন ভট্টাচার্য বা বিনয় রায়কে সম্ভবত আলাদা করে মাথায় রাখতেই হয়নি যে এটা তাঁদের সম্মিলিত শিল্পীমঞ্চের বা সময়ের দাবি। লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিয়ত দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক এতখানিই তীব্র ছিল যে, দুর্ভিক্ষ-পরাধীনতা-দেশভাগ-দাঙ্গা-আকীর্ণ দ্রোহকালের যে ছবি তাঁরা নানা মাধ্যমে এঁকেছেন, তাতে অনায়াসে এসেছে বিভিন্ন

লোক-আঙ্গিকের যৌথ স্মৃতি বা প্রতীক। উদাহরণস্বরূপ, যদি হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে আমরা নিই, দেখব গণনাট্য প্রতিষ্ঠার (এবং মন্বন্তরের) বছর ১৯৪৩– বা তার আগে ১৯৪২ সালেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত গান "তোমার কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান, কিষান ভাই রে" যা সে-সময় কৃষকদের কণ্ঠে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অতিদ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং যে-গান তাঁকে এক বিপুল পরিচিতি দিয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। গানটির সুরসংযোজনায় লুলা নদীতে এক মাঝির গলায় শোনা সারিগানের আদল ব্যবহার করেছিলেন তিনি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস পরে লিখেছেন, এ-গানের এমন অভূতপূর্ব সাফল্য তাঁকে একটা ব্যাপারে সুনিশ্চিত করেছিল যে, জনগণের চেনাশোনা, পরিচিত আঙ্গিকে বিপ্লবী বিষয়বস্তু পৌঁছে দেওয়াই হলো ঠিক রাস্তা। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর একটা অন্য দিকও ছিল। 'আঞ্চলিকতা' শব্দটা তাঁর লোকসংগীতের তত্ত্বায়নের সাপেক্ষে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তিনি মনে করতেন, লোকসংগীতের নির্যাসটুকু ধরা আছে এই শব্দে। এক অঞ্চলের ইতিহাস-ভূগোল-ভাষা-সুর-তাল-লয়-বাজনা-গায়কী, তার কথা বলার ধরন, কাজের ছন্দ, প্রতিদিনের জল-হাওয়া-রোদ-বাতাসে মিশে থাকা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোক-ঐতিহ্যের নিজস্বতা সে-অঞ্চলের লোকসংগীতের প্রাণভ্রমরা। এককথায়, আঞ্চলিকতা বা (তাঁর সৃষ্ট শব্দ) 'বাহিরানা'কে বাদ দিয়ে লোকসংগীত-চর্চা সম্ভব নয়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস: গণনাট্য আন্দোলন, লোকসংগীত ও আত্মসমীক্ষা

হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'গানের বাহিরানা' বইতে 'লোকসংগীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্যা' প্রবন্ধে লিখছেন:

> ... কোনো বিশেষ রচয়িতা যদি আজকের কৃষক-বিদ্রোহের বা তেভাগা আন্দোলনের অমর শহিদদের আত্মদানের অনুপ্রেরণায় লোকসংগীত রচনা করেন– লৌকিক সুর ও রচনার ভঙ্গি অব্যাহত রেখে যা লক্ষ লোকের মনে আলোড়ন তোলে, যা জনসাধারণ গ্রহণ করে তাদের নিজের গান বলে তবে আপত্তির কি আছে? বরঞ্চ এটাই লোকসংগীতের রূপান্তরের স্বাভাবিক ধারা। অথচ আমাদের কিছু গোঁড়া লোকসাহিত্য গবেষক রাজনীতি আছে বলে আঁতকে ওঠেন। কেউবা বলেন, লোকসংগীতে এসব হলো প্রক্ষিপ্ত। সিপাহী-বিদ্রোহে যে অসংখ্য লোকগীতি উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে কি রাজনীতি নেই। ভগৎ সিং-এর উপর যে অসংখ্য গান পাঞ্জাবে ছড়িয়ে আছে, মনিরাম দেওয়ান-এর ফাঁসির উপর যে অসংখ্য গান আসামে ছড়িয়ে আছে তাতে কি রাজনীতি নেই! জাতীয় মুক্তি আন্দোলনজাত গানকে কেউ কেউ স্বীকৃতি দিলেও কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামজাত গানকে তারা কিছুতেই গ্রহণ করতে নারাজ। ভারতের অসংখ্য কৃষি-বিদ্রোহে জনসমাজে বহু গান রচিত হয়েছে। আমাদের গবেষকদের অধিকাংশের প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়ামির জন্য ওই সব গান সংগৃহীত হয়নি এবং অনেক লোপ পেয়েছে।
>
> এখানেই গণনাট্য সংঘ বিশেষ ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সারা ভারতে কৃষক ও শ্রমিকের গণশ্রেণি-সংগ্রাম যত নতুন জীবনবোধে শত শত গান সেদিন রচিত হয়, তার এক অংশ কৃষক আন্দোলনে নিয়োজিত আমাদের মতো শিক্ষিত শ্রেণির রচয়িতা, অন্য অংশ নিরক্ষর চাষীর আপন ঘরেই রচয়িতা। আরেকটি বড়ো অংশ হলো যারা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে ছিলেন না, যারা আউল-বাউল নামেই খ্যাত ছিলেন তাদের ভাবধারায় সেদিনের আন্দোলনের জোয়ারের ধাক্কা পড়েছিল এবং তারাও স্বতঃস্ফূর্ত গান রচনা করেছিলেন। তাই নেত্রকোণায় লক্ষ কৃষক-এর সমাবেশ আমাদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবাহূত রসিদউদ্দিন, জামসেদউদ্দিন প্রমুখ আউলিয়া গায়করা আমাদের সকলকে বিস্মিত করে ময়মনসিংহের 'ব্যালাড' গাইবার বিশেষ ঢঙে যখন গান ধরলেন:

আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কার কাছে জানাই
সুখের স্বপন ভাঙলো রে
চুরাই বাজারে
ভাইরে ভাই তেরশো পঞ্চাশের কথা মনে কেউর পরে গো
মনে কি কেউর পরে
ক্ষুধার জ্বালায় বুকের ছাওয়াল মায়ে বিক্রি করে
চুরাই বাজারে।[২]

> তখন বুঝতে পারি, আউলিয়াদের 'আবহাওয়াতের' ত্রিবেণী সংগমের সাধনা থেকে বিক্ষুব্ধ গণসমুদ্র সংগ্রামে টেনে এনেছে চোরাইবাজার ও দুর্ভিক্ষ। জনসাধারণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তাঁরাও গণবিক্ষোভের শরিকদার। নতুন প্রাণপ্রবাহে লোকসঙ্গীত সমৃদ্ধ হলো। ...আমাদের মতো শিক্ষিত রচয়িতাদেরও কিছু গান লোকসঙ্গীতেই অঙ্গীভূত হয়ে আজও বেঁচে আছে। সে-সময় আমাদের দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ ছিল না। সচেতনভাবে ততটা গান করিনি, আন্দোলনের তাগিদে যতটা করেছি। লোকসঙ্গীত রচনা করব বলে করিনি। এজন্য তার মধ্যে কতকগুলি লোকসঙ্গীত হিসেবে উৎরে গেছে কথায়, সুরে ও ঢঙে। সে-সময় গণনাট্য রচনার অধিকাংশই লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। লৌকিক রূপরীতি ও ঢঙ-এর বিচারে আমরা তাকে বলি 'গণসংগীত'। কিন্তু নিবারণ পণ্ডিত, বিশু পণ্ডিত, রমেশ শীল প্রমুখ সত্যিকার লোকশিল্পীদের সেদিনকার বহু রচনা লোকসঙ্গীতের ধারার সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল। সর্বভারতীয় এই আন্দোলন লোকসঙ্গীতে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল। কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনের একজন আদি উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকে স্বীকার করতেই হয়, আমাদের সেদিন ঘনিষ্ঠ গণসংযোগে থাকলেও লোকসংস্কৃতির ও লৌকিক ঐতিহ্যের অধ্যয়নে যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় দরকার তার সুযোগ ও সময় আমাদের ছিল না। জনসাধারণের সঙ্গে গভীরভাবে মিশবার সুযোগ পেলেও সে তুলনায় সংগ্রহ করতে পারিনি। ফলে আন্দোলনের ঢেউ পলিমাটি যথেষ্ট বয়ে আনলেও সে তুলনায় ফসল আহরণ আমরা করতে পারিনি (বিশ্বাস, ২০১২)।

এই আত্ম-অবলোকন, এই সমালোচনার ভঙ্গিমা তাঁর বই *উজান গাঙ বাইয়া*-র বিভিন্ন আলোচনা বা টুকরো স্মৃতিকথায় বারংবার এসেছে। মূলত নিজের গান নিয়েই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের গান নানাবিধ কারণে যে-সব খাতে বইছিল, তা নিয়েও। এ-কথা মূল আলোচনা থেকে খানিকটা সরে গিয়েই আমি বললাম, কারণ এর পরের অংশে নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন, হাজং বিদ্রোহ এবং নিবারণ পণ্ডিতের গানের প্রসঙ্গের অবতারণা যখন করব, বিশদভাবে আলোচনার অবকাশ না থাকলেও সে-সব গান নিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বিশ্লেষণাত্মক লেখার কিছু সূত্রের প্রতি দিঙ্‌নির্দেশ করব আমি। যাঁরা বিশেষভাবে অবহিত হতে চান এ-প্রসঙ্গ তাঁদের জন্য।

নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন

১৯৪৫ সালে নেত্রকোণার নাগড়ায় তিনদিনব্যাপী সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৮/৯ এপ্রিল। স্থান পারার মাঠ। ইতিহাস-সূত্র থেকে পাচ্ছি (রাশেদা, ২০২১):

১৯৩৮ সালে বিশিষ্ট আইনজীবী কামিনী দত্তের উদ্যোগে কুমিল্লায় প্রথম সারা ভারত কৃষক সম্মেলন হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে সারা বাংলায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ময়মনসিংহ জেলা দায়িত্ব নিতে পারে বলে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ প্রাদেশিক কমিটির সভায় প্রস্তাব দেন মণি সিংহকে লক্ষ্য করে। উত্তরে মণি সিংহ বলেছিলেন, ''আমাদের কমিটিতে এটি আলোচিত হয়নি।'' মুজফ্ফর আহমদ বলেছিলেন, ''আমি বিশ্বাস করি আপনারা এটা পারবেন। অন্য কোনো জেলা এখন পারবে না।" ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সভায় সম্মেলনটি নেত্রকোণায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

মণি সিংহের নিজের কথায়:

নেত্রকোণা শহরের নদীর অপরপারে প্রায় একশত একরের একটি মাঠ সম্মেলনের জন্য নেওয়া হলো। মালিক খুশিমনে তা দিলেন এবং কিছু দূরে তার বাড়িতে সব নেতাদের থাকার ব্যবস্থা করবেন বলে জানালেন। পাহাড় থেকে একশ পঁচিশজন ভলান্টিয়ার আনা হলো। তারা সভাস্থলে বেড়া দেবে, মঞ্চ তৈরি করবে, তাছাড়া হাসপাতাল বানাবে। পঞ্চাশ হাজার ডলু ও তরুই বাঁশ কৃষক ভাই ও জনসাধারণ দান করলেন। এক বাঁশের শহর তৈরি হতে লাগলো। পঁচিশটি টিউবওয়েল পোঁতা হলো। পাঁচশত লাইট বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হলো। এক মাড়োয়ারি রিলিফ কমিটি আমাদের অনুরোধে হাসপাতালের খরচ দিতে রাজি হলেন। গুদামঘর করা হলো। বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষক ও জনসাধারণ চাল দিয়ে এবং অন্যান্যভাবেও সাহায্য করলেন। চাল এসে গুদামে জমা হতে লাগল। লাকড়ির জন্য জেলা বোর্ডের রাস্তার দুইপাশের গাছ থেকে ডাল কাটার অনুমতি নেওয়া হলো। আমরা নদীর ওপর তিনটি পুল বানালাম। এই সকল পরিকল্পনায় ছিলেন অজিত মিত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তার ভালো জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে কমরেডরা সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁদের প্রতিদিন প্রচারকাজে লাগানো হলো। ব্যাপক প্রচারকাজ যখন চলছে, তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হতে দুইটি ইশতেহার বিলি করে ঐ সভায় জনগণকে যোগদান করতে নিষেধ করা হলো। আমাদের সমর্থক উকিলরা বললেন, 'আপনি মুসলিম লীগ নেতা উকিল কবির উদ্দীনের সাথে দেখা করে আপনার বক্তব্য বলেন।' আমি তাই করলাম। বললাম যে, আমরা টংক উচ্ছেদের আন্দোলন করছি- এটা আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন না। কবির উদ্দীন বললেন, 'আপনারা সভা করুন, আমরা বাধা দেব না।' আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করলাম। তিনিও বললেন, 'যাও তোমরা সারা ভারত সম্মেলন করতে পার, আমরা আর কিছু বলব না, দূর থেকে দেখব।' সম্মেলনের কিছুদিন আগে জুঁইফুল রায়ের নেতৃত্বে একদল মহিলা গ্রামে-গ্রামে মহিলাদের মধ্যে প্রচারে বের হয়ে গেলেন। এই সময়ে আমার দিদি নির্মলা স্যান্যালও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসে প্রচারের কাজে অংশগ্রহণ করলেন। নির্মলা স্যান্যাল ছিলেন মেদিনীপুর কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সভ্য। নেত্রকোণা শহরবাসীরা সম্মেলনের আয়োজনের বিশালতা দেখে বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও বিব্রতবোধ করছিলেন। কৃষ্ণ নগর (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে লক্ষ্মীপাল নামে একজন কারিগর এসে আটফুট উঁচু একটি মূর্তি তৈরি করলেন– হৃদয় নামে এক হাজং কমরেডের আদলে। মূর্তিটির হাতের শৃঙ্খল ভেঙে গিয়েছে বটে, কিন্তু পায়ের শৃঙ্খল এখনও আছে। সভামঞ্চ তৈরি করলেন নেত্রকোণার কুশলী কারিগররা। এটা যেমন বৃহৎ, তেমনি অত্যন্ত সুন্দর। পাহাড় অঞ্চলে প্রচার চলেছে কৃষক সভা ও সারা ভারত সম্মেলনের। সেখানে সকলের মধ্যে এমন উৎসাহ সৃষ্টি হলো যে, মেয়ে-পুরুষ, বৃদ্ধ, বাড়ির সকলেই আসবে। আমি বুঝিয়ে বললাম, বৃদ্ধারা বাড়িতে থাকবে আর মেয়ে-পুরুষেরা সভায় আসবে।' ...তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। রেজকির (খুচরা পয়সা) অভাব প্রচণ্ড। কীভাবে সমাধা

করা যায় তা নিয়ে দোকানদারদের সঙ্গে আলাপ করলাম। আমরা বললাম, আমরা কাগজে এক আনা, দুই আনা, চার আনা, আট আনা ছাপিয়ে অভ্যর্থনা কমিটির সিলমোহর করে দিব। আপনারা ঐগুলি পেলে রেখে দিবেন এবং সন্ধ্যার পর অভ্যর্থনা কমিটির হিসাবরক্ষকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাবেন। সব দোকানদার এতে রাজি হলেন। ফলে আমাদের রেজকির সমস্যার সমধান হলো। যাতায়াতেরও সমস্যা ছিল। ট্রেন ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়। নেতাদের ময়মনসিংহ থেকে বাস রিজার্ভ করে আনা হলো। গোটা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এলেন বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ। পি সি যোশী, ভবানী সেন, বঙ্কিম মুখার্জী, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, সোমনাথ লাহিড়ি, গুরুমুখ সিং, হরকিষণ সিং সুরজিৎ, ভাগসিংহ, চন্দ্রিকা সিংহ গাড়োয়ান, গোদাবেরী পারুলেকর, সুন্দরায়া, কেরোলিয়ান, ড. জেড. এ. আহমদ, যদুনন্দন শর্মা, বড় ঠাকুর, ইরাবত সিং মণিপুরি, বিষ্ণু রাতা, কল্পনা যোশী প্রমুখ...

বিপুল-সংখ্যক হাজং উপজাতি মেয়েরা পিঠে তাদের শিশুসন্তান বেঁধে সত্তর/আশি মাইল হেঁটে এসেছিলেন। পথে তাদের অবশ্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া ছিল হাজংদের এক বিশাল ভলান্টিয়ার বাহিনী। কিশোরগঞ্জ থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের বিরাট বাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া ঢাকা জেলা থেকেও কৃষক বাহিনী এসেছিলেন। তাছাড়া মণিপুরের প্রখ্যাত নেতা ইরারত সিং-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের দীর্ঘ ও সবলদেহী শিখরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ...তাছাড়া হাজার-হাজার উপজাতি মেয়েদের দেখে নেত্রকোণাবাসী তো বিস্ময়ে অভিভূত। ...কমিউনিস্টদের কৃষক সংগঠনের শক্তি ও শৃঙ্খলা দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন। প্রকাশ্য বিশাল জনসভায় সমাগম হয় প্রায় এক লাখ লোকের। বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান কৃষক। তাছাড়া হিন্দু ও উপজাতি কৃষকরাও উপস্থিত ছিলেন। জনসমুদ্রের সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ইতিপূর্বে স্মরণকালের মধ্যে এত বিশাল কৃষক সমাবেশ বাংলায় আর হয়নি। প্রতিবেলা একুশ হাজার লোক আহার করতো। পল্লী গায়কদের গান দিয়ে সভা শুরু হয়। হিন্দু-মুসলমান অনেক পল্লীগীতির রচয়িতা, গায়ক, শিল্পী ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে বিনয় রায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অখিল চক্রবর্তী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হেনা দাস, জিতেন সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক মুসলমান গায়কও ছিলেন। এদের গান শুনে সকলে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সম্মেলনের ফলে আমাদের প্রভাব পরিচিতি ও সংগঠনের শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। নেত্রকোণার খুসু রায়, সুকুমার ভাওয়াল, শশী চক্রবর্তী, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী সকলেই সম্মেলন সফল করার জন্য কাজ করেন। ...ময়মনসিংহের আলতাব আলী প্রয়োজনমতো বিভিন্ন জিনিস সরবরাহের ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সাহায্য করেন। গুরুদাস তালুকদার, রবি নিয়োগীরা ছিলেন রন্ধনশালার তদারকে। ...ঢাকার আটশত কর্মীদের পরিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এভাবে বিভিন্ন জেলার কমরেডরা বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত ছিলেন, খোকা রায় ছিলেন ভলান্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক। অবশ্য একমাত্র আমি বাদে ভলান্টিয়ারগণও অনুরূপ পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশজনের মতো চিকিৎসক ছিলেন। এই বিরাট সম্মেলন সমাপ্ত হয় এবং সম্মেলনের যে মূল উদ্দেশ্য; এদেশের নিপীড়িত কৃষকদের সংগঠিত করা– তা সম্পূর্ণ সফল ও সার্থক হয় এবং টংক প্রথার উচ্ছেদ, তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে প্রস্তুতি ও অধিক ফসল উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মুহম্মদ আবদুল্লা রসুল তাঁর *কৃষকসভার ইতিহাস* বইতে লিখেছেন:

> এই বছর (১৯৪৫) সালে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের নবম অধিবেশন বসে নেত্রকোণায়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনের আয়োজন ও সফলতার জন্য সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয় প্রাদেশিক কৃষকসভাকে এবং তার মধ্যে বিশেষ করে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সমিতিকে। প্রায় এক লক্ষ করে কৃষকের সমাবেশ হয় দুদিন। এই সম্মেলনে আদিবাসী হাজং কৃষকদের, বিশেষত হাজং মেয়েদের এবং পার্শ্ববর্তী বৃহৎ গ্রাম বালির মুসলিম কৃষকদের যে বিপুল ও অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তা ছিল সাংগঠনিক দিক থেকে সম্মেলনের সফলতার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান। তিন বছর পূর্বে কিন্তু এই হাজং মেয়েদের অধিকাংশই জীবনে কখনও রেলগাড়ি দেখেনি এবং বালির মুসলিম কৃষকদের ওপর কৃষকসভার কোনো প্রভাব পড়েনি। তিনবছরের মধ্যেই অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই সম্মেলনও কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল।

ব্রিটিশ আমলে কৃষক বিদ্রোহ, পাগলপন্থি বিদ্রোহ, টংক, তেভাগার মতো বিদ্রোহ বারবার সংঘটিত হয়েছে এ-অঞ্চলে। অমর মিত্রের উপন্যাস *মোমেনশাহী উপাখ্যান*– যার বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গারো পাহাড়ের কোলে সোমেশ্বরী নদীর তীরের সুসঙ্গ দুর্গাপুর অঞ্চলের রাজা, জমিদার, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে হাজং পাহাড়িয়া জাতির হাতিখেদা বিদ্রোহ, ভূমির অন্যায্য চুক্তি টংক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং জাতি ও অন্যান্য কৃষকের বিদ্রোহ। সেখানে পড়ি, "এখন অতীনের কাছে বাকিটা শুনে নেওয়া যাক। বাকিটা মানে ১৯৪৫-এ নেত্রকোণায় কৃষক সম্মেলন। মনি সিং-এর ডাকে গারো চাষারা, মুসলমান চাষারা, নমঃশূদ্র চাষারা চলল নেতেরক'ণা।"

কিশোরগঞ্জের কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত গান বাঁধল মণি সিং-কে নিয়ে:

শুনেন যত দেশবাসী, শুনেন ভাই গরিব চাষী, শুনেন সর্বজন,
কৃষক দরদী অধি মনি সিংহের বিবরণ
সংক্ষেপেতে দু এক কথা হে করিব বর্ণন।

কী কথা, না রাজবাড়ীতে মনি সিং রাজার ভাগিনেয় দেখে টংক ধান দিতে এসে হাজং চাষাদিগের কী না হয়রানি। নব্বই তোলায় ফের ওজন ধান নিয়ে এসে শোনে রাজার পেয়াদা একশো তোলায় সের চায়। না দেবে তো ধান নেবে না। বসে থাক। রাজা বলেছেন বৈকালে বাহিরে আঙিনায় আসবেন। তখন বিচার হবে একশো তোলায় সের নেব না নব্বই তোলায় সের। থেমে থাকা আন্দোলন আবার শুরু হলো। রব উঠল:

নব্বই তোলায় সের সের
কত ঠকাইসো, ঢের ঢের ॥
মনি সিং ডাক দিয়েছে
টঙ্ক দিতা না কহিছে।
টঙ্ক দিবা না টঙ্ক না
মিছিল যায় নেতেরক'ণা।

মিছিল চললো নেত্রকোণা। মৈমনসিংহ তখন বাংলার সবচেয়ে বড়ো জেলা। সারা ভারত কৃষক সম্মেলন সেখানে। নেত্রকোণায় কত মানুষ এসেছিল? লক্ষাধিক মানুষ। অতীনের দাদা নীতিন তখন বছর বারো। নীতিনের খুব মনে আছে সেই সম্মেলনের কথা (মিত্র, ২০১৯)।

ব্যক্তিগতভাবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখায় অন্য প্রসঙ্গে নিজের এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে দু-এক লাইন আমরা পেয়েছি।[৩] এবং একটি লেখায় বেশ খানিকটা পেয়েছি। এই সব ক'টি প্রসঙ্গই খুব নিবিড়ভাবে নিবারণ পণ্ডিতের প্রসঙ্গে লেখা। বিস্তারিত লেখাটি বস্তুত 'লোককবি নিবারণ পণ্ডিত' নামে এক সম্মাননা-নিবন্ধের অংশবিশেষ।

পঁয়তাল্লিশ ইংরেজিতে ময়মনসিংহের নেত্রকোনায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনে নিবারণ বাবুর সাথে আবার দেখা হলো। পদ্মকে যেমন দেখতে হয় দিঘীর জলে, লোককবিকে তেমনি চিনতে হয় জনতার মাঝখানে। কলকাতার বিদগ্ধ সাহিত্যিক সমাবেশে এই নীরব নম্র মানুষটি অনেককেই হতাশ করেছিল। তাছাড়া সুগায়ক বলতে যা বোঝায়, নিবারণ বাবু তা নন। নেত্রকোণায় পেশিবহুল আদুল গায়ে কোমরে গামছা বাঁধা লুঙ্গি পরা মুসলমান কৃষকদের জারি নাচের দলের মাঝখানে যখন তাদের কবিকে দেখলাম, সেদিন চিনলাম জনগণের জাদুকরকে! পঁচিশ-ত্রিশজনের জারি নাচের দল নেচে নেচে গাইছিল নিবারণবাবুর জারি গান:

কপালের দুঃখ ঘুচাবো কত দিনে রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে বুঝলাম না বুঝলাম না ভাইরে ঘরে রইলাম বইয়া
চৈতন্য হইল শেষে সংকটে পড়িয়া
অখাদ্য কুখাদ্য ঝাইয়া রোগে অনাহারে
মরছে যখন মা বোন শিশু হাজারে হাজারে রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে সংকটে পড়িয়া তখন হিন্দু মুশ্লীম যত।
গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু হইল মিলিত
খাদ্য দাও বলিয়া দেশে চলল আন্দোলন
দরখাস্ত পড়িল যত গভর্মেন্ট সদন
সস্তা দ্বরে গরিবদের জিনিসপত্র দাও
অন্ন বস্ত্র কুইনাইন দিয়া গরিবেরে বাঁচাও রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে তারপরে চাপে পড়ে বুদ্ধিমান সরকার
মিটাইতেছি দাবী কিঞ্চিৎ করিল স্বীকার
ঘুষখোর আর চোরাদের সামিলে রাখিয়ে
ছালার মুখ বান্ধিয়া ঢালে উভুত করিয়া
(হলো) 'দেড় ছটাক' কন্ট্রোলের দোফায় গরীব বাঁচিবার
শাহীদার হইল যত প্রেসিডেন্ট মেম্বার রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে মুখ চিনিয়া বিলি হইল কন্ট্রোলের কুইনাইন
ট্যাক্স নাই যার কার্ড পাইবো না শাহীদারের আইন

রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উষার
কেউ পায় না ছিড়া তেনা কেউ করে বাহার রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।

একলক্ষ কিষাণের বিরাট জমায়েতের সামনে সভাপতির মঞ্চ থেকে নিবারণ বাবুর গান ময়মনসিংহের বিখ্যাত পল্লীগায়ক অখিল চক্রবর্তীর অনুপম কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল:

একসাথে চল গড়ব মোরা রাঙ্গা দুনিয়া
সবে মিলে থাকব সেথা বিভেদ ভুলিয়া বিভেদ ভুলিয়া
একসাথে চল গড়ব মোরা রাঙ্গা দুনিয়া ॥
নতুন সমাজ গড়ব মোরা দুঃখ করব দূর
হাটে মাঠে তুলব রে ভাই আনন্দেরি সুর
আলো করব আঁধার রাতি
ঘরে ঘরে জ্বালব বাতি
গাইব নব গান
দুঃখ করব অবসান
নতুন সমাজ গড়বে কে রে আয়রে ছুটিয়া, আয়রে ছুটিয়া।

নতুন সমাজ গড়বার সংকল্প ও শপথ লক্ষ লোকের প্রাণে সঞ্চারিত হলো।

ইতোমধ্যে একদিকে কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা, অন্যদিকে নিবারণবাবুর নেতৃত্বে নব-লোকসংস্কৃতির আন্দোলনের প্রভাবে ময়মনসিংহের বহু পেশাদারি লোকশিল্পীর ভিতরে এক নতুন জীবনবোধ জাগ্রত হলো। নেত্রকোনা কৃষক সম্মেলনে এরকম বহু লোকশিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল। ঐতিহাসিক কৃষক মিছিলের সঙ্গে দোতরা, একতারা নিয়ে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন বাউলও গান গাইতে গাইতে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের অগ্রণী ছিলেন রসিদউদ্দীন, জামসেদউদ্দীন ও মজিদ। জামসেদউদ্দীন যখন গান ধরলেন:

আমার দুঃখের অন্ত নাই দুঃখ কার কাছে জানাই
আমার সুখের স্বপন ভাঙল রে চোরাই বাজারে ॥
মিয়া হোসেন মুন্সী গান ধরলেন
দেশে কোন দেশের হাওয়া এলো গো
দেশে কোন দেশের হাওয়া এলো
লবণ কেরোসিন, চিনি, কন্ট্রোলে হয় বিকিকিনি
এই কথাডা সবাই জানি, অনেক লোকেই কইলো
ধনী মানী গুণী কয়জন, একমিলে চলিল।
কাঙ্গালের নাম খাতায় জমা, চিনির মজাডা তারাই মারল
দেশের হাওয়া এলো গো
দেশে কোন দেশের হাওয়া এলো।

সহস্র সহস্র কৃষকের প্রাণে সেদিন দেখেছিলাম তার কি প্রতিধ্বনি! আমরা গণনাট্যের মধ্যবিত্ত গায়কেরাও সেখানে গান করেছিলাম কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল এইসব লোকশিল্পীর ক্ষমতার কাছে

> আমরা সমস্ত আমাদের সমস্ত সুরের কারিগরী সত্ত্বেও কত দুর্বল, গণমনে প্রবেশের গোপন পথটির এরা সহজ উত্তরাধিকারী, আমাদের তা আয়ত্ত করতে এসব শিল্পীর পায়ের কাছে বসে অনেক কষ্টে তা শিখতে হবে। [৪] (বিশ্বাস, ২০১২)।

গীতিকবিতার আঙ্গিক: সুরের উৎস

জারিগানের কথা বলছিলাম একটু আগে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নেত্রকোণা ও নিবারণ পণ্ডিত প্রসঙ্গে উপরিউক্ত লেখা পড়লে সন্দেহ থাকে না, জারিগানের আদলকে একাধারে শোক এবং প্রতিবাদের গানে পরিণত করার একটা সম্ভাবনা এই সময় থেকে তাঁর মনে এসেছিল এবং তার সঙ্গে আউলিয়া ও বাউলদের গানের সুর ও পরিবেশনের ঢঙকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এক নতুন উন্মেষে। গানটির প্রথম অংশের সুর নিশ্চয়ই জামসেদউদ্দীনদের গানের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু 'তুমি যে বীর প্রসবিনী গো' থেকে (অর্থাৎ গানের আধাআধি সময় থেকে) সে প্রভাব দুর্বল হয়ে এক অপূর্ব বিলম্বিত ভাটিয়ালির রেশে মিশে যায়, যার নানা খাঁজে আর ঝোঁকগুলির মধ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নানা নিজস্বতার ছাপ থাকে। আর 'কাইন্দো না মা কাইন্দো না আর' এবং তার পরবর্তী স্তবকগুলি এক উদ্‌যাপন, যেন শোকেরই এক অনন্য উদ্‌যাপন হয়ে ওঠে হোরি বা সারির সুর প্রক্ষেপণে।[৫]

এই গান রচনার সময় তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং গণনাট্য সংঘের অবস্থান নিয়ে আরেকটু বিশদে লিখছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'গণনাট্য ও আত্মকথা' (তৃতীয় পর্ব: ভাঙা বন্দরের যুগ) প্রবন্ধে:

> ... তখন আমাদের বিফল করে রেখেছে দেশ বিভাগের ঘটনা এবং পূর্ব-বাংলা থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্‌বাস্তু মানুষের অসহায়তা, বিশেষ করে আমরা যারা পূর্ব-বাংলার মানুষ, তাদের কাছে এটা একটা বিরাট যন্ত্রণার উৎস হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে লেখা 'মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা' গানটি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়। প্রধানত বাংলার বারোমাস্যা রীতিতে ভাটিয়ালি আঙ্গিকে রচিত এই গানটির কিছু অংশ:
>
> আমার মন কান্দে রে পদ্মার চরের লাইগা দরদী রে
> মন কান্দে পদ্মার পাড়ে লাইগা
> আমার শান্তির গৃহ সুখের স্বপন রে দরদী -
> কে দিল ভাঙ্গিয়া।
> দরদী রে, আশ্বিন মাসে কত খুশিতে
> ভাইধন আইত নাইওর নিতে
> ভরা গাঙে রঙ্গিলা নাও বাইয়া।
> আইজ কুলে আমার লক্ষীন্দর
> বিষে অঙ্গ জ্বর জ্বর
> আমি বেহুলা চলছি ভেলায় ভাসিয়া...
>
> এইরকম একটা হতাশার সময়ে পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনের ওপর চলল গুলি। প্রাণ দিলেন মুসলমান বাঙালিরা। 'মুসলমান' কথাটা সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি। বাংলা-বিভাগের ঠিক পরবর্তী সেই সময়টাতে পশ্চিমবাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়িকতা বেশ খানিকটা ছড়িয়ে ছিল। দেশবিভাগের জন্য মুসলমানরাই দায়ী, এরকম একটা মনোভাব ছিল ব্যাপক।

> সেইরকম আবহাওয়ায় পূর্ব-বাংলা থেকে ভেসে এলো সংবাদ– বাংলা ভাষার মর্যাদা দাবি করে শহিদ হয়েছে আবুল বরকত, রফিক। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিমূলে এ একটা মস্ত আঘাত।
>
> প্রচণ্ড একটা নাড়া লাগল মনে। ঠিক করলাম, পালা গান লিখব। কিন্তু এত বড়ো ঘটনাকে ধরি কোন সুরে? গুণগুণ করতে করতে মনে হলো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যালাডের সুরেই বোধহয় ধরা যাবে। মনে পড়ল নেত্রকোণার নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের রসিদউদ্দীন ও জামসেদউদ্দীনের কথা। সেদিন সমাগত শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এই দুই গায়ক অনাহূত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন গান গাইতে: 'আমার দুঃখের অন্ত নাই/দুঃখ কার কাছে জানাই।/ সুখের স্বপন ভাঙলো রে/ চুরাই বাজারে।' জনতার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিল তাঁদের এ-গান। সেই সুরেই রচলাম 'ঢাকার ডাক'
>
> গান রচনা করতে করতে এমনই অভিভূত হয়ে পড়িনি কোনোদিন। জানি এখানে সুরহীন কথাগুলি দিয়ে তা প্রকাশ করা যাবে না (বিশ্বাস, ২০১২)।

এই গানের রচনার সঙ্গে আরেকজন যুগপুরুষ জড়িয়ে আছেন ঋত্বিক ঘটক। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অন্যত্র লিখেছেন:

> ১৯৫১/৫২ সালের ঋত্বিকের সঙ্গে কলকাতায় যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন গণনাট্যের নাট্যকার অভিনেতা হিসেবেই সকলে তাকে জানত। কিন্তু আমি তাকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম লোকসংগীত-এর একজন সত্যিকারের সমঝদার হিসেবে। আমার তখনকার ওয়েলেসলির সাময়িক আস্তানায় প্রায়ই বিনা নোটিশে হাজির হতো ঋত্বিক। এসময় ঘটল অভাবিত ঘটনা ঢাকার একুশে ফেব্রুয়ারি। ...সাম্প্রদায়িকতায় বিভক্ত বাঙালিচিত্তে সম্পূর্ণ নতুন সংহতির উদ্দীপনা। লিখলাম পূর্ববাংলার ব্যালাডের ঢঙে:
>
> ছিল বুড়ীগঙ্গার মরা পানি
> তার বুকে কে আনিলো জোয়াণী রে
> কার কইলজার খুনে বয় উজানী
> শুকনা বালুর চরে।
> কান্দে বাংলা জননী
> ঢাকার শহরে।
>
> এই দীর্ঘ ব্যালাড রচনার সময় প্রতিটি মুহূর্তে ঋত্বিক ছিল আমার সাথী ও সমঝদার (বিশ্বাস, ২০১২ (ক))।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালেই পার্ক সার্কাসে Peace Cultural Conference-এর এক বিরাট অনুষ্ঠান হয়। তাতে সারা ভারত থেকে শিল্পীরা এসেছিলেন। ওমর শেখ সেই প্রথম কলকাতায় জনসমক্ষে গান করেন। এই অনুষ্ঠানে দশহাজার লোকের সামনে 'ঢাকার ডাক' বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। মনে আছে পৃথ্বীরাজ কাপুর তিনি বাংলা বুঝতেন খুবই ভালো, অনুষ্ঠান শেষে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'Undoubtedly the best production from West Bengal'. এভাবে অভিনন্দিত হওয়ার কারণ ছিল। কিছু অসাধারণ ভালো গায়ক ও বাদকের সমাবেশ হয়েছিল মঞ্চে। মহানন্দ দাস– যিনি রাস্তায় গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তার মতো মিষ্টি মেঠো কলা আমি

জীবনে কমই শুনেছি। ঠিক তেমনি পেয়েছিলাম উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া কণ্ঠ– আলপনা দেবী। অন্ধ টগর অধিকারী বাজিয়েছিলেন বাঁশি। সে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা (বিশ্বাস, ২০১২ (ক))।

এ গান ঘিরে যাঁরা আছেন

এই অসাধারণ গায়ক ও বাদকদের কিছুটা পরিচয় আজ না দিলে, আজকের আলোচনা কোনোভাবে সম্পূর্ণ হবে না। সম্পূর্ণ হবে না যে বাউল আর আউলিয়াদের কথা বারবার নেত্রকোণার আলোচনায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখছেন, তাদের পরিচয় কিছুটা অন্তত না দিলে।

রশীদউদ্দিন

জন্ম: ১১ই জানুয়ারি ১৮৮৯। মৃত্যু: ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৪। বাহির চাপরা, নেত্রকোণার বাউল শিল্পী, কবি ও গীতিকার। রশিদ উদ্দিন ১৫/১৬ বছর বয়সে পার্শ্ববর্তী পুখুরিয়া গ্রামের টাকনা মিস্ত্রির সান্নিধ্যে এসে একটু একটু করে একতারা বাজিয়ে বাউলগান শিখতে শুরু করেন। তখন বাহিরচাপড়া গ্রামে কৃষ্ণলীলা গান শুরু হয়। রশিদ উদ্দিন কৃষ্ণের অভিনয় করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। এ সময় পার্শ্ববর্তী বাংলা বেতাটিসহ সর্বত্র কবিগানের ব্যাপক প্রসার ছিল। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোলপূজাসহ হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে কবিগান ছিল এ অঞ্চলে এক বিশেষ আকর্ষণ। পাশাপাশি টিপু পাগলের নেতৃত্বে ১৮২৭ সনে পরিচালিত ফকির বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ল্যাংটা ফকিরদের জলসা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। তখন বাহিরচাপড়া গ্রামে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি থেকে এক ল্যাংটা পিরের আগমন ঘটে। ১৯০৯ সালে রশিদ উদ্দিন এ ল্যাংটা শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজ বাড়িতে হালকা-জিকিরের জলসায় মেতে ওঠেন। বাউল সাধক রশিদউদ্দিন তাঁর বড়ো ছেলে আরশাদ উদ্দিনের দুইবছর বয়সে তাকে মৃত্যুশয্যায় রেখে হঠাৎ একরাতে গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগী হয়ে তিনি প্রথমে আসেন তাঁর ওস্তাদ কটিয়াদির ল্যাংটা শাহের আখড়ায়। সেখান থেকে তিনি ল্যাংটা শাহকে সাথে নিয়ে চলে যান আসামের লাউরের পাহাড়ে। একবছর সেখানে অবস্থানের পর চলে আসেন সিলেটের শাহ পরানের মাজারে। মারিফতি গানের গুণী শিল্পী রসিদউদ্দিনের গান গ্রামোফোন রেকর্ডে ধরা আছে। পরে তিনি নিজে বাউল গানের একটি দল তৈরি করেন।

মজিদ

সম্ভবত আব্দুল মজিদ তালুকদারের কথাই বলছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। জন্ম: ১৫ই জানুয়ারি ১৮৯৮। মৃত্যু: ৮ই জুন ১৯৮৮। নেত্রকোণার বাউল শিল্পী, গীতিকবি ও সুরকার।

জামসেদউদ্দিন

নেত্রকোণার আটপাড়ার বাউল শিল্পী।

মিয়া হোসেন মুন্সী

কিশোরগঞ্জ সদর থানার পাটধা কুড়েরপাড় গ্রামের অধিবাসী মিঞা হোসেন ছিলেন বিখ্যাত বয়াতি (কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে এটা পরিষ্কার নয়, এঁর কথাই বলছেন কি না হেমাঙ্গ বিশ্বাস)

আলপনা গুপ্ত

একসময়ের প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া গায়ক, চলচ্চিত্রাভিনেত্রী। বহু গুণীজনের সঙ্গে কাজ করেছেন। মঞ্চে, ছবিতে, গানে। যখন গান গাইতেন, চারপাশে কেউ নড়তে পারত না। এক অপূর্ব টিম্বার ছিল গলায়, গাওয়ার সবিশেষ এক ভঙ্গি, আঞ্চলিকতার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ গলা। তেমনই উচ্চারণ। তাঁর গলায় শোনা ভাওয়াইয়া, 'দিনের শোভা সুরুয রে মন/ রাইতের শোভা চাঁদ/হালুয়ার শোভা হাল-কৃষি/ জমিনের শোভা ধান' এখনও আমার কানে ভাসে। নিখিলকুমার চন্দ লিখিত *টগর অধিকারী* শীর্ষক বইতে– যার প্রসঙ্গে আমি একটু পরেই আবার ফিরব, এ'কথা উল্লিখিত আছে যে 'দিনের শোভা সুরুয রে মন/ রাইতের শোভা চাঁদ' টগরের রচিত ভাওয়াইয়া, যদিও এতদিন আমরা অনেকেই একে প্রচলিত/পরম্পরাগত ভাওয়াইয়া বলেই জানতাম।

মহানন্দ দাস

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'লোকসঙ্গীতের দরদি সমঝদার ঋত্বিক' শীর্ষক প্রবন্ধে যে-টুকু লিখেছেন, তার বাইরে আমি তাঁর সম্পর্কে খুব কিছু পাইনি। সেই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি:

> ঋত্বিকের প্রথম ছবি নাগরিক-এর পরিকল্পনার সময়ে দৈনন্দিন আলোচনা আমার সঙ্গে করতো। সে-সময় কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে দেশবন্ধুর স্মৃতি-মন্দিরের নিচে বসে একটি উদ্‌বাস্তু পল্লী শিল্পী গান গেয়ে ভিক্ষা করতো। তার কণ্ঠ ছিল অসাধারণ। সারিন্দা বাজিয়ে সে গান করতো। বাড়ি তার ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে। সে ছিল আমার এক অমূল্য আবিষ্কার; নাম তার মহানন্দ দাস। সে-সময় শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার পাশে মহানন্দকে নিয়ে দাঁড়াতাম। নাগরিক গুমোট পরিবেশে তার কণ্ঠ নিয়ে আসত পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শীতল হাওয়া। ঋত্বিক তার গান শুনে পাগল হয়ে গেল। আমাকে বলল, 'এই তো মাটির গলা। আমি ওকে আমার প্রথম ফিল্মে ব্যবহার করব। একটা পথের ভিক্ষু গায়কের রোলই তাকে দেব'। নাগরিক-এর আউটডোর শুটিংয়ের তাঁবুতে কলকাতার বাইরে মহানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সঙ্গে ছিলেন তখনকার দু-তিনজন নামকরা চিত্রতারকা। মহানন্দ শুটিংয়ের শেষে কলকাতায় এসে ঋত্বিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বড়ো বড়ো শিল্পীর সমানই মহানন্দের খাতির ছিল– কোনো তারতম্য তো দূরের কথা। রাত্রের আসরে মহানন্দের সুর ঝংকৃত দোতারায় প্রায় ঢলে পড়ত ঋত্বিক। প্রথম ছবির ঋত্বিক প্রায় শূন্য হাতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু মহানন্দের অবস্থা সে জানত তাই মহানন্দকে অন্তত পরিশ্রমের দিক দিয়ে খুশি করে দিয়েছিল।

টগর অধিকারী

বিখ্যাত গায়ক, গীতিকার, দোতরাবাদক, গণনাট্যের একসময়ের একনিষ্ঠ কর্মী। জন্ম: দেবগ্রাম, কুচবিহার জেলা। দোতরা ব্যতীত ব্যানা, বাঁশি, সারিন্দা বাজনায় ছিলেন পারদর্শী। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর *মরাচাঁদ* নাটক উৎসর্গ করে গেছেন টগরকে। নাটকের মূল চরিত্রও তাঁকে অনুসরণ করেই চিত্রিত। তুলসী লাহিড়ির *ছেঁড়াতার* নাটকে আবহসংগীতেও ছিলেন টগর। জন্মান্ধ টগর তেভাগা, খাদ্য আন্দোলন এবং নানা গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে শিল্পী-যোদ্ধা হিসাবে কাটিয়েছেন জীবনের অধিকাংশ সময়। [৬]

শেষ-কথা

শুধু এখানে যে-লেখার অংশ উদ্ধৃত করেছি সেগুলো নয়, তাঁর প্রায় প্রতি লেখায়, বলায় বা গায়নের ছত্রে ছত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বিধৃত করেছেন যে পল্লীশিল্পী– গীতিকার-সুরকারেরা তাঁর গান রচনার মূল প্রেরণা, তাঁদের কথা। তপতী মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন:

> ...আমার প্রতি আপনাদের মরম ও ভালবাসাই আমার পুরষ্কার। ...কিন্তু সে ভালবাসাকে প্রকাশ্য মঞ্চের আলোকসম্পাতে দাঁড় করানোতে আমি পরাঙমুখ। আজকালকার পুরষ্কারের হাটে আমাকে না টানলে খুশী হবো। তাছাড়া কে বললো আমি শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীতজ্ঞ? অজ্ঞাত, অখ্যাত গ্রাম-বাংলার এমন কিছু লোকসঙ্গীতজ্ঞকে জানি, যাদের পায়ের কাছে বসে এই বয়সেও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি। কাজেই এ সম্মান আমি দাবী করতে পারি না। (১১.১১.১৯৭৮)

একটি গানের সূত্র ধরে আমি যে এই অজ্ঞাত, অখ্যাত বা অধুনাবিস্মৃত কয়েকজন লোকশিল্পী/লোকসংগীতজ্ঞের সম্পর্কে খুব সামান্য হলেও লিখতে পারলাম, তা স্বস্তিদায়ক। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, যে-অর্থে গণনাট্য সংঘের বা কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক-কৃষক সভা/সম্মেলনগুলি দরিদ্র-প্রান্তিক আঞ্চলিক এবং শহরের মধ্যবিত্ত শিল্পীদের আদানপ্রদানের নির্মাণভূমি হয়ে উঠেছিল, আরো নির্দিষ্ট করে বললে যে-অর্থে শহরের শিল্পীরা প্রতি মুহূর্তে শিখছিলেন, প্রভাবিত হচ্ছিলেন এবং প্রয়োগের চেষ্টা করছিলেন আঞ্চলিক শিল্পীরীতিগুলি, যা গণনাট্যের লোক-আঙ্গিককে প্রতিবাদের হাতিয়ারে রূপান্তরের শিক্ষণরীতির সর্বাগ্রগণ্য বিষয়, তার (অলিখিত) ইতিহাস লেখার সামূহিক প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বহু গানে তাঁর এই ঋণস্বীকার করে গেছেন, অন্তত এ-সূত্র রেখে গেছেন কীভাবে, কোথায় অনুসন্ধান করলে মূল সুর, রীতি, লয়, ঢংগুলিকে পাওয়া সম্ভব, দেখা সম্ভব কী ছিল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সে-সব বিনিময়ের ধরন এবং অবশ্যই, কারা ছিলেন তার প্রকাশ্য বা নেপথ্যের শিল্পী-কারিগর।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস আর্কাইভের মূল কাজ এটাই এবং ভবিষ্যতেও তা হওয়া উচিত বলেই আমার মনে হয়।[৭]

টীকা

১. হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজে এক জায়গায় লিখেছেন: মূল গানটি আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। তাকে বিনয় রায়ের কথায় ছোটো করি। সম্ভবত এই মূল গানটির সাপেক্ষেই তিনি এই কথা লিখেছেন।

২. কোনো এক জায়গায় যখন হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন, "ময়মনসিংহের এই ভাটিয়ালির উত্তরাঙ্গের প্রকারের আকুতিটা লক্ষ করুন..." তখন তিনি এই গানকে ভাটিয়ালি বলে বলছেন বলে আমার মনে হয় না। Theme-wise ভাটিয়ালি বলছেন একে বা সুরকাঠামোকে ভাটিয়ালি-আশ্রয়ী বলে অবহিত করেছেন সম্ভবত।

৩. নিবারণ পণ্ডিত, মণি সিং এবং হাজং বিদ্রোহের গানের বিষয়ে ভিন্নমতের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গ্রন্থ *উজানগাং বাইয়া*। *গণণাট্য সংঘ বনাম গণনাট্য আন্দোলন*, পৃ. ১৪৪-১৪৭ এবং *আমার জবানবন্দি*, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

৪. ইতোমধ্যে পর্বত কেশরী ইরাবত সিং সিলেট জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের মধ্যে আসেন। মণিপুরে প্রবেশদ্বার নিষিদ্ধ ছিল, সেজন্য প্রথমে তিনি সিলেট ও পরে কাছাড়ে চলে যান। তার নেতৃত্বে সিলেট, বিশেষ করে কাছাড়ের মণিপুরী কৃষক সংগঠন যেমন গড়ে উঠল তেমনি তাদের

মধ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। ইরাবত সিং যে শুধু মণিপুরের জননেতা ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পোলো খেলোয়াড়, নাট্যকার ও নৃত্যবিদ। মণিপুরের আধুনিক নাটকের জনক ললিত সিং-এর তিনি ছিলেন দক্ষিণহস্ত। মণিপুরের প্রথম আধুনিক নাটক *আরেপ্পামারূপ*-এর তিনি ছিলেন নায়ক। কাজেই তিনি শুধু কৃষক নেতা নন, সাংস্কৃতিক নেতাও হয়ে ওঠেন। আমাদেও জনপ্রিয় গানগুলি মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করে মণিপুরী কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। ১৯৪৫-এ আমাদের একটি সাংস্কৃতিক দল নেত্রকোণা সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনে যোগদান করে। সেখানে নিবারণ পণ্ডিত, অখিলচক্রবর্তী, রমেশ শীল প্রমুখদের সঙ্গে কৃষাণ সম্মেলনের মুক্তমঞ্চে লক্ষজনতার সামনে অনুষ্ঠান করি। সেখানে কাছাড় থেকে দলবল নিয়ে ইরাবতও গিয়েছিলেন। সেখানে অনেকরকম গানের মধ্যে সাধন দাশগুপ্তের -

চাষী দে তোর লাল সেলাম
তোর লাল নিশান রে
আন্ধার পথে আলো দেয় সে
মুশকিল আসান করে।

গানটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়
(হেমাঙ্গ বিশ্বাস (২০১২) (ক))।

৫. গানের অংশ পাবেন ('সকাল সকাল' অনুষ্ঠান, ডিডিবাংলা, প্রসঙ্গ: হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্মদিন ১৪ই ডিসেম্বর উপলক্ষে অনুষ্ঠান, ২০১৫)।
https://www.youtube.com/watch?v=ypYW5kL6-Y

৬. (নেত্রকোণা) সম্মেলনের সফলতার জন্য ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মীরা যোগ দিয়েছিলেন। টগর অধিকারীও ওই দলে ছিলেন। এর আগে ওখানে নিবারণ পণ্ডিত গান গেয়ে বেড়াতেন, বিশেষত টংক প্রথার বিরুদ্ধে। ... নিবারণ পণ্ডিতের গান নেত্রকোণা অঞ্চলে দারুন জনপ্রিয় ছিল। এখানে যেসব গান গাওয়া হয়, টগর সেসব গানে দোতারা নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'হারে ও কৃষক ভাই/ মোদের কি আর বাঁচবার উপায় নাই।/ হায় হায়রে/ থালা বাসন হাঁড়িকুড়ি গৃহস্থের বেসার/ ক্রমে ক্রমে বিক্রি করে চলেছে সংসার/ অভাবগ্রস্ত প্রায় সমস্ত গৃহস্থ বেকার/ অস্থি চর্মসার হইয়াছে থাকি অনাহার।' সমবেত সংগীতে টগর যে গানটিতে অংশ নিয়েছিলেন তা মূলত জারিগান। নিবারণ পণ্ডিতের এই গানটি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটি: 'কপালের দুঃখ ঘুচবে কতদিনে রে...' নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন থেকেই নিবারণ পণ্ডিতের সাথে টগরের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ১৯৫০-এ ডিসেম্বরে নিবারণ পণ্ডিত পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন। আলিপুরদুয়ারে বসবাস শুরু করেন। কামাখ্যাগুড়ি অঞ্চলে ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে নিবারণ পণ্ডিতের গান জনপ্রিয় ছিল। নিবারণ পণ্ডিত কোচবিহারের আঞ্চলিক ভাষায় অনেকগুলো গান রচনা করেন। তারমধ্যে একটি গান 'হামারগুলা হালুয়া কিষাণ কামাই করি খাং' (কথা: নিবারণ পণ্ডিত, সুর: টগর অধিকারী)। জীবনের শেষ প্রান্তে দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও টগর নিবারণের গানগুলোকে গাইতেন আপন মনে। 'ও বাহে দেওয়ালির ব্যাটা...' তার

মধ্যে উল্লেখযোগ্য। টগর অধিকারী ও নিবারণ পণ্ডিতের জীবনী একই ট্র্যাজেডি। তাই হয়তো ওদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল (চন্দ, ২০০৪)

৭. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণায় সেদিনের লেখা বহু গান লোকসংগীতের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হয়ে জমা রয়েছে। ... পূর্ব-পাকিস্থানের তথা বাংলা ভাষার মোড় ফেরানো ঘটনা ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহের চারণ সুরে রচিত ব্যালাড 'ঢাকার ডাক' কবি জসিমউদ্দীনকে শোনানো হলো। সমস্ত অন্তর তাঁরা (শিল্পীরা) সেদিন ঐ গানে ঢাকার প্রতিনিধির সামনে ঢেলে দিয়েছিলেন..... ভাষা আন্দোলনের ঘটনার ও শহিদদের আত্মদানের বর্ণনা সুরের আশ্রয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাতে কবি জসিমউদ্দীন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। গান এগিয়ে চলছিল... গান শেষ হবার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে কবি মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন লৌকিক ঢঙে যে এই বিষয় নিয়ে এমন গান তৈরি হতে পারে তিনি তা ভাবতে পারেননি...। (বিশ্বাস, ২০১২ (খ))।

তথ্যসূত্র

মিত্র, অমর (২০১৯)। *মোমেনশাহী উপাখ্যান*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রাশেদা, এ. এন (২০২১)। 'অগ্নিযুগের বিপ্লবী মণি সিংহের জীবন সংগ্রাম: যুব সমাজের কাছে আজও প্রাসঙ্গিক'। ঢাকা: সাপ্তাহিক *একতা*।

চন্দ, নিখিলকুমার (২০০৪)। 'টগর অধিকারী'। *লোকশিল্পী পরিচয় গ্রন্থ*, ৪। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মোস্তাফা, মো. গোলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) (২০১৩)। *রশীদ গীতিকা*। ঢাকা: ঝিঙেফুল প্রকাশনী।

রসুল, মুহম্মদ আবদুল্লা (১৯৬৯)। *কৃষকসভার ইতিহাস*। কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন।

বিশ্বাস, রঙিলী (২০২৪)। 'গণনাট্য, একটি নাটকের গান এবং এক মহাফেজখানার ভগ্নাবশেষ'। কলকাতা: *ভান পত্রিকা*। শারদসংখ্যা, ১৪৩১।

বিশ্বাস, হেমাঙ্গ (২০১২)। 'গণনাট্য ও আত্মকথা'। *উজান গাঙ বাইয়া*। সম্পা: মৈনাক বিশ্বাস। কলকাতা: অনুষ্টুপ।

বিশ্বাস, হেমাঙ্গ (২০১২)। 'গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত' এবং 'বাংলার লোকসংগীতের সংকটের স্বরূপ', 'লোকসংগীতের দরদী সমঝদার ঋত্বিক', 'লোকসংগীতের একাল না আকাল?'। *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনাসংগ্রহ-১*। সম্পা: প্রণব বিশ্বাস ও রঙিলী বিশ্বাস। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

পত্রিকা

চৌধুরী, ফারুকুর রহমান (২০১৬)। 'নেত্রকোণার বিশিষ্ট কণ্ঠ শিল্পীগণ'। *ফারুকুর রহমান চৌধুরী ব্লগ*। সাইটে প্রবেশ: ২৮শে জুলাই, ২০২৫।

জাহান, জাহাঙ্গীর আলম (২০১৯)। 'কিশোরগঞ্জে সঙ্গীত চর্চা'। *কিশোরগঞ্জ নিউজ*। সাইটে প্রবেশ: ২৮শে জুলাই, ২০২৫।